পঞ্চম অধ্যায়

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের শিল্পরীতি

দিব্যেন্দু পালিত তাঁর উপন্যাসে নরনারীর পারস্পরিক নিগূঢ় সম্পর্ক রূপায়ণের মধ্যদিয়ে আধুনিক জীবনদৃষ্টিকে উন্মোচিত করেছেন। এই আধুনিক জীবনদৃষ্টি তাঁর উপন্যাসসমূহকে অনন্যতা দান করেছে। আর এই অনন্য জীবনদৃষ্টিকে উপন্যাসে প্রতিবিম্বিত করতে গিয়ে দিব্যেন্দু পালিত খুঁজে পেয়েছেন তাঁর উপযুক্ত শিল্পরীতিকে। হঠাৎ একদিন একটি মাত্র গ্রন্থে এই শিল্পরীতি দেখা দেয়নি। উপন্যাসে এই শিল্পরীতির ক্ষেত্রে দিব্যেন্দু পালিতের স্বকীয়তা ক্রম-উন্মোচিত হয়েছে যেন। বস্তুত এক একটি গ্রন্থের বিচ্ছিন্ন শিল্পরীতির মধ্যদিয়ে নয়, বরং উপন্যাসের নির্মাণশিল্পের এক একটি উপকরণ— উপস্থাপনরীতি, গঠননির্মাণ, ভাষাবিন্যাস ইত্যাদি তাঁর উপন্যাস ধারার মধ্যদিয়ে বিকশিত ও বিবর্তিত হয়েছে। আর এ থেকেই দিব্যেন্দু পালিতের শিল্পরীতির সামগ্রিক রূপটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসগুলির শিল্পরীতির আলোচনা আমরা কয়েকটি দিক থেকে করতে পারি। যেমন—

১. উপস্থাপনরীতি।

২. গঠননৈপুণ্য।

৩. ভাষাবিন্যাস।

কাহিনি বিন্যাসের প্রচলিত রীতি— সর্বজ্ঞ লেখক কর্তৃক কাহিনি বিবৃত করা— এই পদ্ধতিটিকে দিব্যেন্দু পালিত তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সিন্ধু বারোয়াঁ'য় অনুসরণ করেছেন। সাধারণ সাদামাটা একটি ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনিকে উপন্যাসের কেন্দ্রে রেখে লেখক কাহিনির রূপদান করেছেন। গল্পটি বিবৃতও হয়েছে একরৈখিকভাবে। কোথাও কোনো জটিলতা সৃষ্টি হয়নি। একমাত্র ভিলেন চরিত্র পাড়ার বখাটে ছেলে সুনীলকে ঘিরে উপন্যাসের জটিলতা সৃষ্টি করা যেত। কিন্তু লেখক চরিত্রটিকে সরাসরি উপন্যাসে আনেননি। তার সংলাপ পর্যন্তও নেই। কিশোর বয়সে লেখা এই উপন্যাসটি সম্পর্কে লেখক বিরূপ মন্তব্য পোষণ করেছেন—

> "লেখক হবার জন্যে সেই আঠারো-উনিশ বছর বয়সে আমি এতোই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম যে উপন্যাসটি পরিমার্জনা করার বা আদ্যন্ত ফিরে লেখার কথা ভাবিনি।"[১]

দ্বিতীয় উপন্যাস 'সেদিন চৈত্রমাস'-এও একই রকম ব্যর্থতা চোখে পড়ে। এখানেও কিছু যুবক-যুবতীর প্রেমের কাহিনিকে লেখক একমুখী করে বর্ণনা করেছেন। জটিলতা বা দ্বন্দ্ব কোনোভাবেই কাহিনিকে আকর্ষণ করে তুলতে পারেনি। বিবৃতিধর্মীতে লেখক কাহিনি পরিবেশন করেছেন। তবে এখানে অধ্যায় বিভাজন ও প্রতি অধ্যায়ের আরো ছোটো ছোটো পর্ব নির্মাণ করেছেন। পরিচ্ছেদগুলির মধ্যে একঘেয়েমিতা যেমন এসেছে তেমনই এসেছে বৈচিত্র্যহীনতা। ফলে উপন্যাসটি পাঠকমনে কোনো স্থায়ী দাগ কাটতে পারেনি।

তৃতীয় উপন্যাস 'ভেবেছিলাম' থেকে দিব্যেন্দু পালিত নিজের স্বতন্ত্রতার কিছুটা পরিচয় দিয়েছেন। এখানে বিবৃতিধর্মীতাকে তিনি পুরোপুরি বাদ দিয়েছেন। উত্তমপুরুষে নিজের ব্যক্তিজীবনের কাহিনি উপন্যাসের কথককে দিয়ে বর্ণনা করেছেন। সেই 'উত্তমপুরুষ' বা 'আমি' উপন্যাসের ঘটনাকে নিজের অভিজ্ঞতার স্মৃতিকথারূপে তুলে ধরেন। পরবর্তীকালে লেখা 'আমরা' উপন্যাসেও এই রীতির প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু 'ভেবেছিলাম' বা 'আমরা' কোনোটাই খাঁটি আত্মজীবনীমূলক বা লেখকের ব্যক্তিজীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস হয়ে ওঠেনি। তবে এই দুটি উপন্যাসে ঐ ধরনের উপন্যাসের ঈষৎ লক্ষণ যে প্রকাশ পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

চতুর্থ উপন্যাস 'মধ্যরাত'-এর বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্য এনেছেন। কিন্তু কাহিনি পরিবেশনের দিক থেকে সেই গতানুগতিকতাকেই জোর দিয়েছেন। এই উপন্যাসে অনেক চরিত্র (এই উপন্যাসেই সবচেয়ে বেশি চরিত্র) থাকলেও একমাত্র প্রধান চরিত্র তপতী ছাড়া আর কারো কথা নেই বললেই চলে। লেখক এখানে নিজে না বলে উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র তপতীর মাধ্যমে কাহিনিকে পরিবেশন করেছেন। ফলে অন্যান্য চরিত্রগুলি তেমন জীবন্ত হয়ে উঠতে পারেনি। কাহিনির গতিকে বিকশিত বা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। আবার তপতী যখন অতীত স্মৃতিচারণা করেছে তখন তার মুখের সংলাপ কেড়ে নিয়েছেন লেখক। যেমন—

> "অতীতে দু-বার বাধ্য হয়ে তাকে শবযাত্রার সঙ্গী হতে হয়েছিল। প্রথম, বাবার মৃত্যুর সময়। তপতী তখন ছোটো, সব কথা আজ আর স্মরণ হয় না।...সকলের পিছনে তপতী, খালি পায়ে এলোচুলে।...ছোটো বলে সেদিনের মৃত্যু স্বাভাবিক হয়ে দেখা দিয়েছিল; বিহ্বল হয়ে পড়লেও কোনো রকম অসহায়তা দেখা দেয়নি মনে।"[২]

এভাবে চরিত্রের মুখের সংলাপ কেড়ে নিয়ে চরিত্রের বাক্-স্বাধীনতাকে ফুটতে দেননি লেখক। ঘটনার বিবৃতি দানে লেখক এতোটাই তৎপর ছিলেন যে চরিত্রগুলোর মনোজগতের ছবিও স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। তাই উপন্যাসটির দ্বিতীয়বার পরিকল্পনা করেছিলেন। ১৯৮৮ সালে পরিবর্তিত আকারে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় 'স্বপ্নের ভিতর' নামে। উপন্যসের মাঝখানে নীতিশের সঙ্গে তপতীকে ঘিরে উপন্যাসের জটিলতা বা দ্বান্দ্বিকতা সৃষ্টি করতে পারতেন লেখক। কিন্তু সেই দিকে এগোননি। কেবল উপন্যাসের মাঝে বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা এনেছেন। যেমন, মেসের মেয়েদের আড্ডা-গল্পগুজব, নীলার বিয়ের পর প্রত্যেকের শূন্যতা অনুভব করা, অঞ্জলির আকস্মিক অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়া, বিধবা সাবিত্রীর রহস্যময় গতিবিধি, উপন্যাসের শেষে মেসবাড়িতে পুলিস আসা ইত্যাদি ঘটনা খুবই ধীর গতিতে পরিবেশিত হয়েছে।

'প্রণয়চিহ্ন' উপন্যাসে লেখক নিজে বিবৃতিদানের মধ্যদিয়ে কাহিনি বর্ণনা করেননি। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র নমিতার মধ্যদিয়ে কাহিনির প্রথম থেকে শেষ অবধি বর্ণনা করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে নমিতার বিবৃতিতে শুরু হয় উপন্যাস—

> "পরিতোষ চলে যাচ্ছিল। দরজা পর্যন্ত গিয়ে থেমে দাঁড়াল। নিছকই থেমে দাঁড়ানো। আমি জানি, পরিতোষের কিছু বলার নেই। অনেকক্ষণ ধরে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করেছে ও, কথা বলেছে আন্তরিক ভাষায়। এই অবস্থায় একজন পুরুষ যা যা করে ও যেভাবে, পরিতোষের ব্যবহারে তার সামান্য তারতম্য ঘটেনি।"[৩]

উপন্যাসটি শেষও হয় তারই উক্তিতে—

> "আমার আশপাশ দিয়ে মানুষজন হাঁটতে লাগল। এদিক থেকে ওদিকে ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, মোটর ক্রমাগত ছুটে যাচ্ছে, আসছে, যাচ্ছে। সমবেত ধ্বনি আলতোভাবে ছুঁয়ে যাচ্ছে কান। একা দাঁড়িয়ে এইসব দেখতে দেখতে গলা পর্যন্ত নিশ্বাস উঠে এল আমার। মনে হল অনেকদিন এই সরব ব্যস্ততা লক্ষ করিনি আমি। আজ একটু দেখি।"[৪]

উপন্যাসে আগাগোড়া নমিতার আত্মকথায় বিবৃতিদানের প্রসঙ্গ এলেও দশম পরিচ্ছেদের শেষে নকশাল আন্দোলনের প্রসঙ্গ এনেছেন লেখক। নকশালকর্মী চন্দন পুলিসের হাত থেকে

বাঁচতে নমিতার কাছে আশ্রয় নিয়েছে। এই অংশটি উপন্যাসে না হলেও ক্ষতি হতো না। কেননা উপন্যাসটি মূলত নমিতা আর পরিতোষের নষ্ট দাম্পত্যসম্পর্ক নিয়ে। সেখানে নমিতার বান্ধবী মানসীর ছেলে চন্দনকে টেনে এনে নকশাল আন্দোলনের প্রসঙ্গকে তুলে ধরার কোনো মানে হয় না। তাই ২০০৩ সালে উপন্যাসটির ('একদিন সারাদিন') দ্বিতীয়বার পরিকল্পনা করেন লেখক। সেখানে নকশাল আন্দোলন বা চন্দনের প্রসঙ্গ নেই। তবে ইতিহাস বা সময়কে ছুঁয়ে যাবার একটা প্রচেষ্টা করেছেন লেখক।

১৯৭১ সালে লেখা 'সন্ধিক্ষণ' উপন্যাসের মধ্যদিয়ে দিব্যেন্দু পালিতের স্বতন্ত্রতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের ধরনও বদলে যায়। উপন্যাসগুলি আয়তনে যেমন ছোটো হয়ে আসে, কাহিনি তেমনই আরো একমুখী হয়ে ওঠে। চরিত্রের প্রাচুর্যও কমে যায়। ব্যক্তিগত জীবনে দিব্যেন্দু পালিত এই সময় অনেক বদলে গেছেন। শুধু বয়সই বাড়েনি, অন্যান্য অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন পরিবেশ, বিভিন্ন ব্যক্তির সংস্পর্শ, জীবিকা প্রভৃতি সবকিছু তাঁকে বদলে দিয়েছে। একদা গ্রামের ছেলে দিব্যেন্দু পালিত হয়ে উঠেছেন নাগরিক দিব্যেন্দু পালিত। নাগরিক মনন ও জটিলতায় পরিক্রম করেছে তাঁর লেখা ও লেখা সম্পর্কিত ভাবনা। নিতান্ত সখ দিয়ে যার শুরু, অমনোযোগ ও দ্রুত লিখনের ছাপকে অতিক্রম করে তিনি লেখক হিসেবে পরিবর্তিত হয়েছেন। 'কিছু স্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান' গ্রন্থে জানান—

> "লেখক হিসেবে আমি যে পরিবর্তিত হচ্ছি— বদলে যাচ্ছে সূচনার ভাষা, চিন্তায় সংযুক্ত হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যক্তি ও চরিত্র ক্রমশ আক্রান্ত হচ্ছে তাদের পরিবেশ ও তাদের থেকে উঠে আসা শুভ-অশুভের দ্বন্দ্বে— তার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যেতে পারে।"[৫]

'সন্ধিক্ষণ' উপন্যাসটি শুরু হয়েছে আকস্মিকতা দিয়ে। উপন্যাসের শুরুতেই মৃত্যুর সিচুয়েশন এনেছেন লেখক। ছোটোগল্পের মতো প্রথমেই একটা চমক দিয়েছেন যাতে পরের দিকে এগিয়ে যেতে হয় পাঠককে। কনকের আকস্মিক মৃত্যুতে উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে এসেছে বিষণ্ণতা। যা এই উপন্যাসটির মূল সুর। জীবনের বাঁচা ও মরার সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে প্রতিটি চরিত্রের ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্যকে বিচার করেছেন লেখক। কনকের মৃত্যু প্রথম পরিচ্ছেদে হলেও সেই মৃত্যুকে ঘিরে জটিলতা এসেছে অষ্টম পরিচ্ছেদে অমিয়-রেখার

দাম্পত্যসম্পর্কে। কনকের সঙ্গে রেখার পূর্ব সম্পর্ক ঘিরে অমিয় আর রেখার মধ্যে চলে চাপা মান-অভিমান আর অশান্তি। সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে অমিয়র মনে সন্দেহ দানা বেঁধেছে। সন্তানসম্ভবা রেখার মুখ দিন দিন ফ্যাকাসে হতে থাকে। অদৃশ্য থেকেও কনকই উপন্যাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে। মৃত মানুষ উপন্যাসে কতোখানি স্থান নিতে পারে দিব্যেন্দু পালিত তাঁর এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন। উপন্যাসটিতে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিণতি দেখাননি লেখক। উপন্যাসের শেষে রাজনীতির পরিমণ্ডল এনেছেন। সময়টি সেই অশান্ত নকশাল আন্দোলনের সময়। যখন সবকিছু থেকে শূন্যতায় ভরে ওঠে জীবন, তখন লেখক দেখান রাজনীতির আশ্রয়ে নিজেদের ভীতকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে। মিছিলের মধ্যে মিশে থাকা দাশরথির ঊর্ধ্বে তোলা মুঠি সে প্রত্যয়ই এনে দেয়।

ঔপন্যাসিক দিব্যেন্দু পালিত তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাস প্রথম পুরুষে রচনা করলেও উত্তম পুরুষ ও প্রথম পুরুষ— দুধরনের রীতিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। 'সম্পর্ক', 'বিনিদ্র', 'বৃষ্টির পরে', 'চরিত্র', 'উড়োচিঠি', 'আড়াল', 'স্বপ্নের ভিতর', 'অবৈধ' প্রভৃতি উপন্যাসগুলি সম্পূর্ণই প্রথম পুরুষে লেখা। যেমন—

১. 'গাড়ি চালাতে চালাতে শক্ত হাতে স্টিয়ারিং ধরে অনেক দিন পরে শরীরে আসুরিক শক্তি অনুভব করছিলেন রামতনু'। ('সম্পর্ক', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ৬৭)

২. 'রুচি আড়াল চেনে। শুধু মেয়েমানুষ বলেই নয়; নিজস্ব কারণেও'। ('আড়াল', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-২, পৃ. ১৪৩)

৩. 'বিশাখা স্বপ্ন দেখে না। কিংবা দেখলেও এমন কোনও স্বপ্ন দেখে না, রাতের গাঢ় ঘুম ও আচ্ছন্নতার মধ্যে যা জাগিয়ে তুলবে হঠাৎ, শোক কিংবা সুখের রেশ তার পর থেকে অনেকক্ষণ নতুন এক আচ্ছন্নতায় ডুবিয়ে রাখবে তাকে'। ('স্বপ্নের ভিতর', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-২, পৃ. ৩৭৩)

দিব্যেন্দু পালিত তাঁর এক একটি উপন্যাসে এক একটি পুরুষে কাহিনি বিবৃত করলেও কিছু কিছু উপন্যাসে দুই পুরুষেরই ব্যবহার করেছেন। উপন্যাসের একটি পরিচ্ছেদ প্রথম পুরুষে শুরু হলেও পরবর্তী পরিচ্ছেদ শুরু হয়েছে উত্তম পুরুষে। যেমন 'একা'

উপন্যাসটি প্রথম পুরুষে শুরু হয়েছে— "বারো দিন পরে একদিন সকালে রাস্তায় বেরিয়ে ঝরঝরে বোধ করল শিশির'। ('একা', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ৩৯৩) কিন্তু তৃতীয় পরিচ্ছেদটি শুরু হয়েছে উত্তম পুরুষে— 'তোদের এই ডায়লগ-টায়লগের ব্যাপারগুলো, অতনু, আমি ঠিক বুঝি না'। ('একা', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ৪২৩) শিশিরের এই আত্মভাষণ শেষপর্যন্ত অনুসৃত হয়নি। লেখক আবার শিশিরের কথা বলার দায়িত্ব নিজের কাঁধেই তুলে নিয়েছেন। শেষতম পরিচ্ছেদে লেখক এবং শিশির দুজনে মিলে কথা বলেছে— 'যেতে যেতে ক্রমশ একদিন আবার পুরনো সিঁড়িতে পা রাখল শিশির'। ('একা', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ৪৫৬) এবং 'না, বেশ আছি। এখন এখানে; একটু পরে উঠে যাবো। দ্যাখো, কেমন সুন্দরভাবে কেটে যাচ্ছে এক-একটা দিন'। ('একা', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ৪৫৭) এভাবে একটি উপন্যাসের মধ্যে দুই-পুরুষের যাতায়াত হলেও চরিত্রের নিজস্ব অনুভূতি প্রকাশে কখনো কোনো ছেদ পড়েনি। আসলে উপন্যাসের চরিত্রের মনের কথা ঔপন্যাসিকই বেশি জানেন।

'অন্তর্ধান', 'অনুভব', 'অনুসরণ', 'সোহিনী এখন কোথায়' প্রভৃতি কয়েকটি উপন্যাসে দিব্যেন্দু পালিত সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র এবং নমুনা-সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য কাহিনির প্রয়োজন মতো ব্যবহার করেছেন। 'অন্তর্ধান' উপন্যাসে সংবাদপত্রে প্রকাশিত কিছু সংবাদ বিচ্ছিন্ন এবং পরিবর্তিতভাবে ব্যবহার করেছেন। উপন্যাসটির শুরুতে আছে একটা সাসপেন্স এবং এই সাসপেন্স সমগ্র উপন্যাসটি জুড়ে সৃষ্টি করেছে এক ধরনের অনুসন্ধান। প্রথম পরিচ্ছেদের শেষে সুশোভনের দাদা চিন্মোহন মারা গেছেন এবং তাকে দেখতে গিয়ে ফেরার সময় সুশোভনের অষ্টাদশী মেয়ে পুতুলের আকস্মিক অন্তর্ধান উপন্যাসে এক ধরনের সাসপেন্স সৃষ্টি করেছে। থানায় ডায়েরি করলে পুতুলকে খুঁজতে ব্যর্থ হয় পুলিস-প্রশাসন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে চলতে থাকে সুশোভনের নিরন্তর অনুসন্ধান। এরপর খবরের কাগজে সংবাদ বের হয়— 'উদ্ধার করা তরুণী গোয়েন্দাদের হেফাজত থেকে উধাও' এবং 'সুশোভন মুখার্জিও হারিয়ে গেলেন?' এবার সুশোভনের স্ত্রী তেষট্টি বছর বয়স্ক স্বামী সুশোভনের হারিয়ে যাওয়ার ঘটনার জন্য থানায় এফ. আই. আর. করেন। সুশোভনেরও কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। এই ঘটনার তিন মাস পরেও খবরের কাগজের বিষয় হয়ে ওঠেন সুশোভন ও তার মেয়ে পুতুল। উপন্যাসটি শেষও হয় এই রকম একটা সাসপেন্সের মধ্যদিয়ে।

'অনুসরণ' এবং 'সোহিনী এখন কোথায়' উপন্যাস দুটির শুরুতে আছে কিডন্যাপের ঘটনা। যেমন, 'অনুসরণ' উপন্যাসের প্রথমে— 'আঠাশ বছর বয়স্কা একটি বিবাহিতা যুবতীকে নিয়ে গভীর মধ্যরাতে উধাও হয়েছে একটি ট্যাক্সি, ড্রাইভার-সহ সেই ট্যাক্সিতে ছিল আরো দুটি সন্দেহজনক চরিত্রের পুরুষ, উধাও হবার আগে মহিলার স্বামীকে মারধোর করে ফেলে দেয় রাস্তার ধারের গর্তে...' ('অনুসরণ', পৃ. ৩০) এরপর চলতে থাকে স্ত্রীকে খোঁজার জন্য অনীশের অনুসন্ধান। অনীশ পুলিসকে ঘটনাটি জানালেও সবার কাছে তা গোপন রাখতে চেয়েছিল। ঘটনাটি আড়াল করার জন্যই দিব্যেন্দু পালিত এই উপন্যাসটির অবতারণা করেছেন। এই রকম পরিস্থিতিতে দিব্যেন্দু পালিত দেখাতে চেয়েছেন মানুষের বিভিন্ন মনোভাবকে। এই উপন্যাসের শেষে লেখক আইন আদালতের প্রসঙ্গ এনেছেন। অনীশকেই পুলিস গ্রেপ্তার করে এবং কোর্টে চলতে থাকে তার মামলা। এখানেই উপন্যাসটি শেষ হয়।

'সোহিনী এখন কোথায়' উপন্যাসের প্রথমে সংবাদপত্রে খবর বের হয়— 'চিকিৎসার খরচ মেটাতে না পেরে ফ্ল্যাটে দম্পতির আত্মহত্যা' এবং 'আত্মঘাতি সাতাশ বছরের সুন্দরী ও জনপ্রিয় টেলিভিশন অভিনেত্রীর'। এরপর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষে ধীমানের স্ত্রী সোহিনীকে কিডন্যাপের ঘটনাটি লেখক 'অনুসরণ' উপন্যাসের মতোই বর্ণনা করেছেন। এই উপন্যাসেও ধীমান স্ত্রীর কিডন্যাপের ঘটনাটি আড়াল করেছে। দিব্যেন্দু পালিত এই উপন্যাসের শেষে জানান, 'কাহিনি অংশে আমার 'অনুসরণ' উপন্যাসের কিছু কিছু বর্ণনা পরিবর্তিত প্রেক্ষিতে প্রক্ষিপ্তভাবে ব্যবহার করা হয়েছে'। ('সোহিনী এখন কোথায়', পৃ. ১৫৮) এইভাবে গল্পের মধ্যে একটা 'সাসপেন্স' সৃষ্টি করে গল্পের ঔৎসুক্যকে আগাগোড়া বজায় রাখতে চেষ্টা করেছেন লেখক।

দিব্যেন্দু পালিত কোনো কাহিনি বা ঘটনা বর্ণনা করে উপন্যাস রচনা করেননি। তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাসেই দেখা যায় তিনি মাঝখান থেকে কাহিনি শুরু করেছেন কিংবা তাঁর উপন্যাসের শুরুটা হয়েছে একটা অস্পষ্টতা দিয়ে। যেমন, 'অনুভব' উপন্যাসটি শুরু হয়েছে— 'সিনেমায় কিংবা টেলিভিশন সিরিয়ালে দেখা যায় যায় এমন। না, সিরিয়ালেও কি?' ('অনুভব', পৃ. ০৯) এরপর উপন্যাসের গতি সামনের দিকে একটানা অবিরাম হলে তা ক্রমেই অধিকতর দ্রুত ও তীব্র হয়ে ওঠে। এরজন্য লেখক ফিল্মের ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতির

সাহায্যে সেই গতিকে কিছুটা মন্থর করে আনেন। সিমার্‌স্ কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দিতে এসে অতীতে ফিরে যায় আত্রেয়ী। রাহুলের সঙ্গে যখন সম্পর্কটা টিকল না, তখন আত্রেয়ী কোনো বাড়াবাড়ি করেনি। এরপরেই চিন্তার অনুবিশ্ব তাকে দহনক্লান্ত করে তুলেছে। বর্তমানে বসে ভবিষ্যতের সঙ্গে স্মৃতিকে গুলিয়ে ফেলেছে সে। সময়ের বেড়াজালে এক আন্তর্জাতিক সমস্যার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন লেখক তাকে। বিদুষী নারী আত্রেয়ী অপমান সহ্য করতে না পেরে স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে আসে। স্বাধীনভাবে থেকেই ইউনেস্কোর রিসার্চ প্রোজেক্টে যোগ দেয়। দেহোপজীবিনীদের মর্মান্তিক জীবনযাপন ছিল তার গবেষণা ও সমীক্ষার বিষয়। এইসব নারীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য তাকে জীবনের পূর্ণতা এনে দেয়। সে তার অস্তিত্বের একটা মানে খুঁজে পায়।

দিব্যেন্দু পালিত উপন্যাসের উপস্থাপনায় একটি নতুন কৌশল ব্যবহার করেছেন। অতীতস্মৃতির সূত্র ধরে কাহিনিকে তিনি এগিয়ে নিয়ে গেছেন। সেই অতীত স্মৃতি আবার বাস্তবের অনুষঙ্গে পাশাপাশি ব্যবহার করেছেন। যেমন— 'মধ্যরাত' উপন্যাসে তপতী বর্তমানের পাশাপাশি হঠাৎ অতীতস্মৃতিতে ভাবতে থাকে। নিজের বাবা-মার মৃত্যুজনিত স্মৃতিতে সে একাকীত্ব অনুভব করে। 'আমরা' উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যখন অমলাদি দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার কথা প্রিয়নাথকে বলে, তখন প্রিয়নাথ তার পাঁচ বছরের পুরনো ঘটনাকে মনে করে। আবার 'স্বপ্নের ভিতর' উপন্যাসে বিশাখা ও অর্পিতাও যখন মেসের নির্জন পরিবেশে একা থেকেছে তখন তারা অতীত স্মৃতিতে নিমগ্ন থেকেছে।

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসগুলির শেষে কোনো তৃপ্তি বা পরিপূর্ণতা নেই। উপন্যাসগুলি শেষ হয় একটা সাসপেন্সে। ছোটোগল্পের পরিণতির মতোই উপন্যাসগুলি শেষ হয়েছে। যেমন, 'সন্ধিক্ষণ' উপন্যাসে নিখিল আর বুলা রেস্টুরেন্ট থেকে রাস্তায় মিছিলে দেখেছিল অনেক লোকের ভিতরে মিশে থাকা দাশরথিকে। তার পর লেখকের বক্তব্য— 'ওরা অনেক দূর পর্যন্ত দাশরথির উপর চোখ রাখল। অনেক দূর পর্যন্ত ওঁর উত্তোলিত হাতটা দেখা গেল। শেষে ধ্বনির রেশটুকু ছাড়া আর কিছুই থাকল না'। ('সন্ধিক্ষণ', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১,পৃ. ৬৩) 'সহযোদ্ধা' উপন্যাসের শেষে আদিত্যকে পুলিস অ্যারেস্ট করে ধরে নিয়ে গেছে। আদিত্য এর পরিণাম জানে না, জানে না পাঠকও। আদিত্যর স্রষ্টার বক্তব্য— 'শুধু বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে গেটে দাঁড়ানো পুলিস ভ্যানটার দিকে

এগোতে এগোতে ভাবল, হতে পারে এটাই সেই ভ্যান, একদিন রাস্তা থেকে যেটা নেমে গিয়েছিল ময়দানের অন্ধকারে'। ('সহযোদ্ধা', পৃ. ৬৯) আবার, 'অনুভব' উপন্যাসের শেষাংশে আত্রেয়ী কাউকে কিছু না বলে রেজিগনেশন লেটার সেক্রেটারির হাতে দিয়ে অনির্দিষ্টতার উদ্দেশ্যে রাস্তায় পা বাড়ায়, সেই ঘটনায় পাঠককেও বিষণ্ণতায় পড়তে হয়— 'ক্ষণিকের স্তব্ধতা ঘিরে ধরে আত্রেয়ীকে। এরপর যাবে কোথায়? কার কাছে?' ('অনুভব', পৃ. ১২৮) এরকম একটা প্রশ্নে উপন্যাসটি শেষ হয়। আবার 'বহুদূর অভিমান' উপন্যাসের শেষাংশে দেখা যায়, লেখক প্রথমে বিবৃতি দেন— 'পরমহংস অন্য কোথাও চলে গেল'। তারপর মাঝখানে তিন বন্ধু রাজদীপ, পরমহংস এবং সায়নের সংলাপ—

> পরমহংস বলল, 'ঠিক আছে, তুই সিগারেট খেলে বুড়ো হাঁসও খাবে— '
> রাজু বলল, 'তাহলে রাজু বনলতার কাছে যাবে— '
> পরমহংস বলল, 'যাবে— '
> সায়ন বলল, 'তাহলে সায়ন ন্যাংটো মেয়ের ছবি দেখবে— '
> পরমহংস বলল, 'দেখবে— '
> এরপর শেষে লেখকের বিবৃতিতে উপন্যাসটি শেষ হয়— 'গেট পেরিয়ে অন্ধকারে কাঁচা রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল ওরা'। ('বহুদূর অভিমান', পৃ. ৭৩)

উপন্যাসের সুষ্ঠু ও সার্থক শিল্প-অবয়ব রচনা সম্পর্কে দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ অবহিত ছিলেন। সেই অবয়ব যে সবসময় এক বা অপরিবর্তিত থেকেছে তা নয়। প্রয়োজন অনুসারে তিনি বারবার তার কাঠামো পরিবর্তন করেছেন। সে প্রয়োজন আসলে বিষয়বস্তুকে যথাযোগ্যভাবে রূপায়িত করার জন্য। আর সেই বিষয়বস্তু বিচ্ছিন্নভাবে কাহিনি, চরিত্র বা পরিবেশ নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে দিব্যেন্দু পালিতের নিজস্ব মানসপ্রবণতা এবং তাঁর জীবনঅভিজ্ঞতা। এই দৃষ্টিভঙ্গির রূপান্তরকে যথাযথভাবে বিধৃত করার জন্য অপরিহার্যভাবে তিনি শিল্প-আধারেরও বদল ঘটিয়েছেন। আর তাই প্রথমদিকের উপন্যাস 'সিন্ধু বারোয়াঁ', 'সেদিন চৈত্রমাস', 'প্রণয়চিহ্ন' প্রভৃতি থেকে 'সন্ধিক্ষণ'-এ পৌঁছতে তাঁকে উপন্যাসের গঠন বদল করতে হয়েছে। এর দশবছর পর 'সহযোদ্ধা'য় কিংবা তারও দশবছর পরে 'অনুভব'-এ এসে দেখা যায় আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেছে তাঁর উপন্যাসের গঠনবিন্যাস।

কাহিনি ও চরিত্রের সমন্বয় সাধনই ঔপন্যাসিকের মূল লক্ষ্য হলেও দিব্যেন্দু পালিত তাঁর উপন্যাসে জোর দিয়েছেন অন্যত্র। নিছক কাহিনি সৃষ্টি তো নয়ই, আবার নানা ধরনের চরিত্র সৃষ্টিও নয়। উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে তিনি চেয়েছেন নরনারীর সম্পর্কের গভীর উদ্ভাসন। তাই একই বিষয় নিয়ে অনেক উপন্যাস গড়ে উঠেছে। যেমন, যুবক-যুবতীর প্রেম নিয়ে 'সিন্ধু বারোয়াঁ', 'সেদিন চৈত্রমাস' এবং নষ্ট-দাম্পত্যসম্পর্ক নিয়ে 'অবৈধ', 'সিনেমায় যেমন হয়', 'মাত্র কয়েকদিন', 'একদিন সারাদিন', সেকেন্ড হনিমুন' প্রভৃতি। আসলে চরিত্রের সামগ্রিক সত্তা তিনি মাত্র একটি উপন্যাসে তুলে ধরেননি। একই নারীপুরুষ বিভিন্ন উপন্যাসে তাদের সামগ্রিক সত্তার একটু একটু করে ঢেলে দিয়েছেন যেন।

উপন্যাসের অবয়ব-সমগ্রতা বিষয়ে দিব্যেন্দু পালিত জানান—

> "আমার উপন্যাসের আয়তন সাধারণত বেশি হয় না। অকারণে কলেবর বৃদ্ধির প্রতি আমার আকর্ষণ বরাবরই কম। বরং লেখায় আমি পরিমিতিবোধকেই প্রশ্রয় দিই বেশি। বিদেশি বা ইউরোপীয় সাহিত্য পাঠের অভ্যাস থেকেই আমার এই অভ্যেস গড়ে উঠেছে, এটা স্পষ্ট।... বিষয়ের প্রয়োজনই লেখার দৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট করে। অতিকথন যে-কোনও রচনারই বড় ত্রুটি গণ্য হতে পারে। লেখায় সংযম যে-কোনও সময়ে একটি বড় গুণ। লেখায় শিল্পগুণ বা ভাষাগুণ বলতেও এটাই বোঝায়; অন্তত আমি এভাবেই বুঝেছি।"[৬]

প্রথম উপন্যাসে তিনি একেবারে প্রচলিত ধারায় কাহিনি রচনা করলেও দ্বিতীয় উপন্যাস থেকে পরিচ্ছেদ বা অধ্যায় বিভাজন করেছেন। পরিচ্ছেদ সংখ্যাও খুবই কম। যেমন— দ্বিতীয় উপন্যাস 'সেদিন চৈত্রমাস'-এ পরিচ্ছেদ সংখ্যা মাত্র সাতটি, 'আমরা' উপন্যাসে পাঁচটি, 'একা' উপন্যাসে ছয়টি, আবার 'অহংকার' উপন্যাসে (চারটি পরিচ্ছেদ) দেখা যায় পরিচ্ছেদগুলির নামকরণ করেছেন— প্রথম পরিচ্ছেদ— ফ্ল্যাটে কান্নার শব্দ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ— নীপার তৃতীয় চোখ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ— সুদেষ্ণা এখন কী করবে?, চতুর্থ পরিচ্ছেদ— ভোরের ঘটনা।

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের অবয়ব নির্মাণে স্বতন্ত্রতার পরিচয় পাওয়া যায় দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে 'সন্ধিক্ষণ' উপন্যাসের মধ্যদিয়ে। একটি মৃত্যুকে ঘিরে বিভিন্ন চরিত্রের মানসিক টানাপোড়েন উপন্যাসটির মূল বিষয়বস্তু। মৃত্যুটি উপন্যাসের একেবারে শুরুতেই এনেছেন,

অনেকটা ছোটোগল্পের চমকের মতো। মধ্যবিত্ত কেরানি দাশরথির একমাত্র পুত্র কনকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কাহিনিকে লেখক তিনটি সমান্তরাল রেখায় শেষ অবধি টেনে গেছেন— প্রথমত, একমাত্র উপার্জনশীল ছেলেকে হারিয়ে দাশরথির পরিবারের সংকটময় অবস্থা। দ্বিতীয়ত, কনকের বোনদের ঘিরে তারই বন্ধু নিখিল আর শ্যামলের আচরণগত অসংগতি। তৃতীয়ত, কনকের মৃত্যুকে ঘিরে সবচেয়ে বেশি কাহিনি উত্তপ্ত হয়েছে রেখা আর অমিয়র দাম্পত্যসম্পর্কের মধ্যে।

মাত্র এগারোটি পর্বে বিন্যস্ত এই ছোটো উপন্যাসটি যেন আগাগোড়া ছোটোগল্পের মতোই ব্যঞ্জনাধর্মী। দিব্যেন্দু পালিতের প্রিয় ঔপন্যাসিক আলব্যের কামু। অস্তিত্বের জিজ্ঞাসা, জীবনসত্যের অন্বেষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর উপন্যাসেও। স্মৃতির সূত্রে কিংবা নানা প্রশ্নের ফ্রেমে দিশাহারা সময় লেখকের কুশলীয় দক্ষতায় ধরা পড়ে। 'সন্ধিক্ষণ' আসলে স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাস। প্রথাসিদ্ধ বা ঘটনাবহুল টানা কাহিনি লেখক বর্ণনা করেননি।

আঁটসাঁট ঘটনার ঘনঘটা কিংবা গল্প অপেক্ষা টুকরো টুকরো ছবির কোলাজে রচিত 'সবুজগন্ধ' এবং 'সোনালী জীবন' উপন্যাস দুটি। মাত্র পাঁচটি পর্বে বিন্যস্ত 'সবুজগন্ধ' উপন্যাসটি। উপন্যাসের নামকরণটি অবশ্যই ব্যঞ্জনাধর্মী। নায়কের ভূমিকাটিই এখানে প্রতীক রূপে দেখা দিয়েছে। কুশ্রীতা ও বিকৃতির বাতাবরণের মাঝে সে প্রতিবাদ করতে জানে। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে এভাবে— 'সঙ্গে নিয়ে কিংবা পাশাপাশি হাঁটলে এক রকম গন্ধ পাওয়া যায়। বৃষ্টিভেজা সবুজের আর্দ্রতা মেশানো... স্নিগ্ধ ও রহস্যময়, ঠিক কেমন বোঝা যায় না'। ('সবুজগন্ধ', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ৬৪৯) উপন্যাসের শেষেও রাতের অন্ধকারে নিরাকার ময়দানের দিকে হাঁটতে থাকে দীপঙ্কর। সময়ের বিরুদ্ধেই তাঁর যুদ্ধ। তবু সময়েরই কাছে চেয়ে নেয় একটু একা হবার সময়। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মানুষের হেরে-যাওয়াটা বড়ো ভয়ঙ্কর। শুধু অন্ধকারই পারে দীপঙ্করকে আড়াল করতে। দীপঙ্কর এখানে আগাগোড়া 'সরলরেখা'য় হাঁটেনি। শেষ বিচারে উপন্যাসটি সুররিয়ালিস্টিক হয়ে ওঠে, শৈলীও তাই।

'সোনালী জীবন' উপন্যাসটিও আয়তনে ছোটো এবং ছোটো ছোটো কোলাজ দিয়ে গড়া। একমাত্র এই উপন্যাসেই লেখক পর্বের মধ্যে ছোটো ছোটো উপশিরোনাম দিয়েছেন। মাত্র ছয়টি পর্বে বিন্যস্ত। উপশিরোনামগুলি তুলে ধরলে এর ইঙ্গিতধর্মিতাও চোখে পড়বে।

প্রথম পর্বে— আর্থারের শোক, দেশ ত্যাগের সিদ্ধান্ত, স্যামুয়েলের অস্ট্রেলিয়া, বিপর্যয়ের শুরু, সারার হয়রানি, বড়োবাবুর কাছে, বলাৎকারের পটভূমি, অপমানের পরে, রবিনের অনুশোচনা, ভালোবাসায় প্রত্যাবর্তন, সাদা পোশাকের ডাক, মায়ের জন্য উপহার, স্মৃতির দিকে, দূরদর্শী বড়োবাবু, রুজির মুখ দেখা, ডরোথির সামনে, অন্ধকার বারান্দা, সারার প্রশ্ন, চকোলেটের স্বাদ, দৃশ্যটা নতুন নয়। দ্বিতীয় পর্বে— রোজালিনের প্রস্তাব, মরা ইঁদুর ও ভাঙা পাঁচিল, শিশি-বোতলের হাসি, আর্থারের স্বপ্ন দেখা, বিষণ্ণ ডরোথি, লরার চিঠি। তৃতীয় পর্বে— টেলিফোনের আর্তি, অন্য এক জীবনে, কিছু অস্পষ্ট প্রশ্ন, এ কেমন ভালোবাসা, অপমানিত মাইকেল। চতুর্থ পর্বে— ডোনাল্ডের শক্তি পরীক্ষা, অড্রির প্রশ্ন, অবুঝ ডেইজি, হঠাৎ আবির্ভাব, দ্য ব্রেভ ইজ দ্য ব্রেভ। পঞ্চম পর্বে— মন খারাপের সূচনা, রিপন স্ট্রিটে বড়দিন, সেই অদ্ভুত মানুষটি, অপ্রত্যাশিতের আবির্ভাব এবং ষষ্ঠ পর্বে— ডোনাল্ডের প্রশ্ন।

এই উপন্যাসটি আর একটি দিক দিয়েও বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। একমাত্র এই উপন্যাসের চরিত্র বিদেশী, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। আর্থার পাইবাস, ডরোথি, সারা, স্যামুয়েল, অড্রি, লরা, রোজালিন, ডোনাল্ড— এমন সব উপন্যাসের চরিত্ররা দিব্যেন্দু পালিতের আর কোনো উপন্যাসে আসেনি। বিদেশী হলেও তারা কলকাতার বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যেমন, অড্রির সিঁথিতে সিঁদুর পড়ার বিষয়টি, অস্ট্রেলিয়ায় যাবার পরেও সারাদের কলকাতা শহরের জন্য মন খারাপ করা ইত্যাদি।

'আমরা' চরিত্রকথনমূলক উপন্যাস। উপন্যাসটির কথক চৌত্রিশ বছর বয়সী প্রিয়নাথ মজুমদার। পাঁচটি পর্বে বিন্যস্ত উপন্যাসটিতে কোনো কাহিনি কাঠামো নেই। উপন্যাসের ঘটনা বস্তুও বৃত্তাকারে এগিয়েছে। 'আমি তনুশ্রীকে ভালোবাসি, তনুশ্রী আমাকে, একদিন আমাদের বিয়ে হবে— ' এইভাবেই শুরু হয়েছে উপন্যাসটি। এরপরে প্রিয়নাথের মনে প্রশ্ন ওঠে, 'কী হে, ঠিক তো? ঠিক ভালোবাসা তো?' কোনো উত্তর খুঁজে পায় না। শুধু গভীর এক আবেশে ভরে ওঠে তার বুক, নিঃশ্বাস হয়ে ওঠে এলোমেলো। তনুশ্রীর ভালোবাসা তার খুব প্রয়োজন। তাদের ভালোবাসার সম্পর্কটা বিবর্ণনীয় বলেই প্রিয়নাথ বুঝে উঠতে পারেনি।

> "সেতারের তারের মতো একটু ছুঁলেই এখন তা বেজে ওঠে টুংটাং শব্দে; তার শরীর, মন আর গন্ধের মৃদু কোরাস সারাক্ষণ বেজে যায় আমার রক্তে।"[৭]

প্রিয়নাথ তার বিচারবুদ্ধি দিয়ে সমস্ত কিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছে। দশবছর আগে যে ভাবনা প্রিয়নাথের মনে এসেছিল, দশবছর ধরে সেই ভাবনা একই পথের একাধিক বিন্দুতে ঘটে গেছে। কিন্তু ভাবনার কোনো পরিবর্তন হয়নি। বৃত্তাকারে তার কাহিনির আবর্তন চলেছে। সে তনুশ্রীকে নিয়ে, কৌশিকের স্ত্রী মীনাকে নিয়ে, নয়নাংশুর স্ত্রী সুধাকে নিয়ে গল্প লিখতে চেয়েছে। সেইসব গল্পে জীবন চলমান কিন্তু প্রিয়নাথ তাতে অবগাহন করতে পারেনি। বিধবা অমলাদিকে নিয়ে যে গল্প লিখেছিল তাতে সম্পাদক মহাশয় তার গল্পকে ছাপতে নারাজ হয়েছিল। কেননা আজকাল আর 'বিধবা-টিধবা' নিয়ে গল্প চলে না, রোমান্টিকতা সবার পছন্দ। প্রিয়নাথ অমলাদির জীবনের গভীর রহস্য উন্মোচন করে। আলোচ্য উপন্যাসের কোনো সুনির্দিষ্ট পরিণতি দেখাননি লেখক। প্রিয়নাথ, অমলাদি, তনুশ্রী, কৌশিক, বসন্ত দাস— সকলের মানসিক অভিপ্রায়কে বোঝাতে কাহিনির নামকরণও হয়ে যায় 'আমরা'। এই উপন্যাসের শেষটুকুও কবিতার মতো। টেক্সট ও কনটেক্সট এখানে বহুস্বরিক হয়ে ওঠে। 'আমি' আসলে এখানে তৃষিত, অচরিতার্থ। আর 'আমরা' বাখতিন্ কথিত 'ক্রনোটেপ অব এনকাউন্টার'। অতীত স্মৃতি এখানে এক গভীর অর্থ অর্জন করে। আর এখানেই দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের প্যারোটিডের বিশেষ অর্থ ক্রনোটোপে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আপাত তুচ্ছ ঘটনা অন্য অর্থ পায়। উপন্যাসেও বিশেষ একটা রঙ এসে লাগে।

'সহযোদ্ধা' উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের ধারায় একটি বিশিষ্ট সংযোজন। একটি সরলরেখা ধরে এই উপন্যাসের কাহিনি পরিবেশিত হয়েছে। পঞ্চাঙ্ক নাটকের মতো এর গঠন বিন্যাস। এর সূচনাংশে দেখা যায়, ভোরের আবছা আলোয় আদিত্য রায় ময়দানে একটি রাষ্ট্রীয় হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছে এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়া; রাইজিং অ্যাকশন-এ— প্রবল মানসিক টানাপোড়েনে পুলিসকে হত্যাকাণ্ডের বিবরণ জানানো এবং পুলিস কর্তৃক ঘটনাটির মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়া; ক্লাইম্যাক্স-এ— মনে প্রবল সাহস নিয়ে খবরের কাগজে আদিত্য রায়ের সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে চিঠি লেখা; ফলিং অ্যাকশন-এ— আদিত্যকে পুলিসের ভয় দেখানো এবং নকশালপন্থীদের ধমক ও সাবধানবাণী; সমাধান অংশে— গভীর রাতে আদিত্যকে পুলিসের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া। উপন্যাসটির শেষেও আছে এক ধরনের নাটকীয় চমক। মনে হয় যেন অন্য এক ধরনের নাটকের শুরু হয়। কল্পনাবিলাসী ভীতু পাঠক আদিত্য রায়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চমকে উঠতে পারেন। সাহসী

দৃঢ়চেতা পাঠক আদিত্য রায়ের দুঃসাহসী চেতনায় তার সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন। আর যারা নীতিবান পাঠক তারা আদিত্য রায়ের নৈতিক লড়াইয়ের সহযোদ্ধা হয়ে ওঠেন।

দিব্যেন্দু পালিতের সবচেয়ে ব্যতিক্রমী উপন্যাস 'অনুভব'। উপন্যাসটিতে রয়েছে আন্তর্জাতিক মনোভাব। আন্তর্জাতিক বাস্তবতাই উপন্যাসটির ধ্রুববিন্দু। ন্যারেটিভ ফর্মকেও লেখক এখানে ভাঙেন। উপন্যাসটি সম্পর্কে লেখক বলেন—

> "Through her narration, I tried to get at the international reality. I had to break away from the narrative form, I intermingled the story with history, research findings and case studies and other facts."[৮]

রচনাশৈলীও বদলে যায় এখানে। লেখক টানা বর্ণনা না করে রিপোর্ট-এর গড়নটি যথাযথ রাখেন। সাতটি পরিচ্ছেদ থাকলেও পঞ্চম পরিচ্ছেদে কলগার্লদের যে কেস হিস্ট্রিগুলি লেখক তুলে ধরেছেন সেগুলি সংবাদপত্রের রিপোর্টের আকারে লিখিত। যেমন—

আই. এন. ভি./সি. জি.— ১০/৪

কন : এন. এন. পি. এম.

শকুন্তলা :

নাম : শকুন্তলা। ডাকনাম : খুকি (মা, বাবা ওই নামে ডাকত)। কল নাম : কুন্তী। বয়স : ৩৭। ঠিকানা : চেতলা (পুরো ঠিকানা বা রাস্তার নাম বলেনি; 'যারা এনেছে তারা জানে'), পার্ক সার্কাসে জনৈক ম্যাডামের ফ্ল্যাট থেকে অপারেট করে। টান টান চেহারা, স্বাস্থ্য ভালো। রং : পরিষ্কার (উজ্জ্বল শ্যাম)। মুখচোখ : সুশ্রী (আকর্ষণীয়ও বলা যায়), ঈষৎ ক্লান্ত, গালে ও কপালে দু' তিনটি বসন্তের দাগ আছে। উচ্চতা : ৫'-৪"। ('অনুভব', পৃ. ৮৯)

একইভাবে মায়া, পামেলা, রাজমীদেরও কেস হিস্ট্রিগুলি সাজানো। এইসব রিপোর্ট থেকেই কীভাবে নিজস্ব সিদ্ধান্তে বা অনুভবে পৌঁছে যায় আত্রেয়ী— তারই কথা 'অনুভব' উপন্যাসে আছে। টানা বর্ণনা না করে এই রিপোর্ট-এর ভঙ্গিটুকু দিয়েই পাঠকের মন আকর্ষণ করতে চান লেখক।

এই উপন্যাসের কাহিনি কখনো ভারবাহী হয়ে ওঠেনি। 'আমরা' উপন্যাসের প্রিয়নাথ যেমন কেন্দ্রে থেকে প্রধান ভাষ্যকাররূপে উপস্থিত, আত্রেয়ীর ক্ষেত্রে তেমন নয়। পরোক্ষ ভাষণে ও সক্রিয় দ্বিস্বর ভাষ্যে লেখকের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। এখানে সবচেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে বিষয় এবং বিষয়ের সত্যনিষ্ঠতা। প্রসঙ্গত লেখক বলেছেন—

> "My novel may fail to impress some, but the truth of the subject cannot fail. This could have been written in any Indian language or for that matter in any language the world over. I have mentioned the global dimensions of regional literature. My novel, successful or not, is one example of just that."[৯]

দিব্যেন্দু পালিতের ক্ষমতার পরিচয় তাঁর ভাষা সৃষ্টিতে, উপমা নির্বাচনে এবং চিত্রকল্পে। তিনি শিল্পগুণ বা ভাষাগুণ বলতে বুঝিয়েছেন সংযম। তিনি মনে করেছিলেন অতিকথন যে কোনো রচনারই বড়ো ত্রুটি। দিব্যেন্দু পালিত অনেকটা অঙ্কের ক্যালকুলেশন করে উপন্যাস রচনা করেছেন। গুণে গুণে শব্দ ব্যবহার করা তাঁর লেখার একটা বৈশিষ্ট্য। তাঁর লেখায় বাড়তি শব্দ যেমন নেই, তেমনি নেই বাড়তি উচ্ছ্বাস। এটা তাঁর লেখার প্রতি একটা সংযম, একটা জেদ। খুবই চমৎকারভাবে তিনি ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে ব্যাখ্যা করেছেন। মনে হয় মাইক্রোস্কোপের তলায় ফেলে তিনি কোনো সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করেছেন। আবেগপ্রবণহীন সেই সব লেখাগুলি অনেক সময় অধ্যায়হীন, পরিচ্ছেদ থাকলেও খুবই কম, পৃষ্ঠার সংখ্যাও অল্প। দিব্যেন্দু পালিত উপন্যাস লেখার সময় নিজেকে ভাষাশিল্পী হিসেবে দেখেছেন। সময়ের ধারাভাষ্যকার হিসেবে নয়। তিনি বলেছেন, "আমি উপন্যাস লিখেছি মূলত আমার সাহিত্যভাবনা, ভাষাভাবনা থেকেই।"[১০]

দিব্যেন্দু পালিত অপরূপ অনায়াসে পদসজ্জায় বৈচিত্র্য এনে বাংলা গদ্যকে নিয়ম-অনিয়মের বেড়া ভেঙে অপূর্বতা দান করেছেন। এই বৈচিত্র্য বিষয়ে তাঁর রচনা থেকে কয়েকটি বাক্য দেখানো হলো—

১. 'অনুভব' উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শুরুতে দেখা যায়— যৌগিক বাক্যের প্রথম অংশ শুরু কর্তৃপদ দিয়ে আবার শেষ অংশ সমাপ্তও হয়েছে কর্তৃপদ দিয়ে—

'আদিনাথরা বেরুচ্ছেন, ওঁদের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গিয়েছিল পম্পা'। ('অনুভব', পৃ. ২৯)

২. কর্তৃপদহীন বাক্য— 'আনন্দে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করছিল'। ('ভেবেছিলাম', দিব্যেন্দু পালিতের প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, পৃ. ১৭৭), 'এম ফিল করছিলাম। শেষ করতে পারিনি'। ('অনুভব', পৃ. ২৫)

৩. কর্মপদ দিয়ে বাক্য শুরু হয়েছে— 'তোমাকে তো জানি, তাই তোমার ওপর অনায়াসে বিশ্বাস করি, নির্ভর করি'। ('সিন্ধু বারোয়াঁ', দিব্যেন্দু পালিতের প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, পৃ. ১৭) আবার, কর্মপদহীন বাক্য— 'আমি ঘামছিলাম'। ('ভেবেছিলাম', দিব্যেন্দু পালিতের প্রথম পাচঁটি উপন্যাস, পৃ. ১৭৭)

দিব্যেন্দু পালিত এক সময় সক্রিয়ভাবে ভাষা চর্চা করেছেন। বাংলা ভাষা সবসময় ক্রিয়াপদ দিয়ে শেষ হতে চায়— করছি, খাচ্ছি, বলছি কিংবা করলাম, খেলাম, গেলাম, বললাম ইত্যাদি। ক্রিয়াপদের এই ব্যবহারকে তিনি অনেকটা আড়াল করেছেন সচেতনভাবে। বাক্যের মধ্যে সেই ক্রিয়াপদকে কীভাবে লুকানো যায়, কীভাবে শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহার থেকে ভাষাকে মুক্তি দেওয়া যায়— প্রথম থেকেই এই প্রচেষ্টা করে গেছেন। এই বিষয়ে তাঁর বক্তব্য—

> "এই চেষ্টা করতে করতে আস্তে আস্তে আমার স্টাইলটাই এমন হয়ে গেছে যে লিখতে লিখতে কোথাও যদি এমন হয়, তখন কলমই থেমে যায়, ...সেই জন্য একই লেখায় কাছাকাছি জায়গায় আমি দুটো একরকমের বাক্য লিখি না। একটা বাক্য সবসময় আর একটা বাক্য থেকে আলাদা হয়। দুটো একই শব্দ ব্যবহার করি না।"[১১]

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে ক্রিয়াপদের ব্যবহার বৈচিত্র্য দেখলে অনায়াসে লেখকের ভাষা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বোঝা যাবে। যেমন, ক্রিয়াপদ ব্যবহার না করেই বাক্য নির্মাণ করেছেন— 'হাতে ম্যাগাজিন, দৃষ্টি সেখানেও।' কিংবা 'বয়সটা ভয়ের'। ('সোনালী জীবন', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-২, পৃ. ১৪৫) একঘেয়েমিকতাকে দূর করতে বাক্যের মাঝখানে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। যেমন— 'দুপুরে মেঝেয় মাদুর পেতে শোয়ার অভ্যাস আছে আহামরির। এবং ঘুমোনোর। শোয়া ও ঘুমোনোর মধ্যবর্তী সময়টুকু সে বই পড়ে...

ইদানীং মাঝেসাঝে একটা রঙচঙে কেচ্ছার ম্যাগাজিনও মাদুরে ছড়িয়ে থাকতে দেখেছে ব্রতীন, কখনোবা খবরের কাগজ'। ('চরিত্র', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ৩১৯) বাক্যের শুরুতেও ক্রিয়াপদের ব্যবহার দেখা যায়— 'দেখল, সংলগ্ন বালিশে মাথা রেখে শুয়ে আছে শ্বেতা'। ('সহযোদ্ধা', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-২, পৃ. ২১)

কখনো কখনো সংযোজক অব্যয় দিয়ে বাক্য শুরু করেছেন— 'লীনা সেই অর্থটাই খুঁজলেন। এবং ভাবলেন, এসব খবর দেবার সময় লোকে কমিয়েই বলে'। ('অন্তর্ধান', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-২, পৃ. ৪৫৫), আবার কখনো কখনো সংযোজক অব্যয় দিয়ে বাক্য শুরু ও সংযোজক অব্যয় দিয়ে বাক্য শেষও করেছেন— 'এবং এরা যেহেতু নিজেদের সতীসাধ্বী স্ত্রীদের স্বাস্থ্য ও আয়ু রক্ষার দায়িত্ব নিতে পারে না, সুতরাং সর্বজনসম্মতিক্রমে এদের কাজ হবে যতো সোমত্ত যুবতীদের ঢেঁড়া পিটিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে রেপ করা এবং— ' ('একা', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ৩৯৯)

বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে একঘেয়েমি দূর করার জন্য তিনি বিভিন্ন ধরনের বাক্য গঠন করন। বাক্যের আকারের দিক থেকে দেখা যায় তিনি বাক্যকে ছোটো, বড়ো করেছেন। যেমন, পাঠকচিত্তে অনিশ্চয়তা বা সাসপেন্স সৃষ্টির প্রয়োজনে তিনি অনেক সময় দীর্ঘ শাখায়িত বাক্য ব্যবহার করেছেন—

> "পরের ভাবনায় ঢুকতে ঢুকতে রুচি ভাবল, যদি কখনও, কোনও কারণে দীপঙ্কর জেনে ফেলে যে শীমুর এসে পড়াটা মিথ্যে, একটা অজুহাত দেখিয়ে কথা বলাটা বন্ধ করেছিল রুচি, তাহলে তার সম্পর্কে কীরকম ধারণা হবে দীপঙ্করের! যার জন্যে হঠাৎ হলেও সারাক্ষণ টান অনুভব করছে এত, যার জন্যে জরুরী কাজ থাকা সত্ত্বেও ক্যান্সেল করল নাগাল্যান্ডে যাওয়া, যার জন্য, হয়তো, এবং যতই গোপন করে রাখো, বাড়িতে ভোগ করছ অশান্তি— প্রবল উন্মাদনায় মুখ রেখেছ যার ঠোঁটে ও বুকে, যার শরীরে বিদ্যুৎ ঝলসে যেতে যেতে বলেছ এই অবস্থাতেই মৃত্যুর কথা ভাবা যায়— আই উড টু লাইক টু ডাই লাইক দিস; অর্থাৎ, যে তোমাকে এনে দিচ্ছে পৌরুষের পূর্ণতা, তাঁর মধ্যে কোথাও আছে ছোট্ট একটু মিথ্যা, যা মুহূর্তেই ধসিয়ে দিতে পারে সব ভাবনা, সব সম্ভাবনা, সব নির্ভরতা!"[১২]

চেতনাপ্রবাহরীতির প্রয়োগ দিব্যেন্দু পালিতের প্রায় সব উপন্যাসেই দেখা যায়। এই ধারার উপন্যাসে ঔপন্যাসিক অনেক সময় সরল বা শাখায়িত বাক্যের আশ্রয় করে এমন সব বাক্য অবলম্বন করেন যেগুলো বাক্য নয়, বরং বাক্যাংশ। শাখা-প্রশাখাযুক্ত জটিল বাক্যের পৃথুল রূপ আধুনিক কালের কোনো লেখকের পছন্দ নয়। পাঠকও আকর্ষণ অনুভব করতেন না। এই জন্য দিব্যেন্দু পালিত কখনো কখনো ছোটো ছোটো বাক্য ব্যবহার করেছেন। আবার কখনো কখনো একটি শব্দে একটি বাক্য ব্যবহার করেছেন। যেমন—

১. 'সিঁড়ি। ফুটপাথ। শব্দ। কলকাতা। এবারেও কণাকে বেরুতে দিল আগে। মসৃণ গোড়ালি। মেয়েটি স্বচ্ছন্দ হোক'। ('একা', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ৪১৫)

২. 'পেট্রোলের গন্ধ। কলকাতা। কলকাতার গন্ধ। শ্রীলার গন্ধ! চন্দনের গন্ধ! ঘুমের গন্ধ— ' ('একা', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ৪৩৩)

৩. 'হেসে মাথা নাড়ল রজত। কামড়াবে। সুতরাং, প্রস্তুত থাকো'। ('উড়োচিঠি', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ৪৩৩)

৪. 'এটা ধ্রুবর ফ্ল্যাট, সে-ই এগিয়ে এল। প্রথম'। ('আড়াল', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-২, পৃ. ১৪৯)

লেখক উপন্যাসের কাহিনি পরিবেশনের ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করলেও সাধারণত ক্রিয়ার অতীত রূপের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। কিন্তু উপন্যাসে কাহিনি পরিবেশনের ক্ষেত্রে একঘেয়েমি এড়াবার জন্য কখনো কখনো লেখক ক্রিয়ার কালের রূপ পরিবর্তন করেছেন। যেমন— 'অবেলায় ঘুমিয়ে পড়ার আগে আজ অনেক দিন পরে আবার ফিরে এসেছিল দৃশ্যটা'। ('চরিত্র', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ৩২৭) — এখানে ক্রিয়াটি 'এসেছিল' অতীতকালের হওয়া সত্ত্বেও ক্রিয়ার কালবাচক বিশেষণটি হলো 'আজ'। 'আজ' শব্দটি এখানে 'যেদিনের কথা বলা হচ্ছে সেইদিন' অর্থে প্রযুক্ত। উপরন্তু এই প্রয়োগের ফলে সূক্ষ্ম বোধটি জাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, ঘটনাটি অতীতকালের হলেও নিকট-অতীত কালের। দিব্যেন্দু পালিত শব্দকে আভিধানিক অর্থ গণ্ডীর বাইরে এনে প্রয়োগ করেছেন।

সহজ সরল গদ্য ভাষার উদাহরণ—

> "ছোট্ট কাচের জারে জড়াজড়ি করে বেঁচে থাকা মাছগুলোকে অ্যাকুইরিয়ামের বড়ো জলে উপুড় করে ছেড়ে দিলেই ডানার জড়তা কাটিয়ে আত্মহারা, তারা ছুটতে থাকে নানা দিকে। ওইভাবেই পেয়ে যায় যে যার নিজের রঙ ও পূর্ণতা। তারপর আবার ফিরে আসে পরস্পরের দিকে— মেতে ওঠে আলাপ, পরিচয়, ভালবাসা ও আক্রমণে।"[১৩]

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে ভাষা কখনো কখনো কবিত্বধর্মী হয়ে উঠছে। উপন্যাসে এসেছে গীতিময়তা ও মননশীলতা—

> ১. 'ক্রমশ নির্জন হয়ে আসে রাস্তা। মধ্যরাতে ঘুম থেকে হতচকিত জেগে ওঠার পর যেমন হয়, হঠাৎ থেমে-পড়া থেকে আস্তে আস্তে পুনরার্বিভূত হয় নিঃশ্বাস। দূর বেতারে সংযোগ স্থাপনের মতো একান্ত হাওয়ায় একটিমাত্র শব্দ ভেসে আসে আমার কানে, আস্তে আস্তে ঘুমের মতো ছড়িয়ে পড়ে রক্তের সর্বত্র। আছি, আছি'। ('আমরা', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ১৮২)

> ২. 'মাঝরাতের বৃষ্টি বড়ো একা করে দেয়। একটানা অঝোর শব্দে জড়িয়ে থাকে এক ধরনের শূন্যতা— এই মুহূর্তে ভেবে নাও তুমি কে, কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এতোকাল ভাবিত করেছ নিজেকে— কোন সম্ভাবনা ও বিশ্বাস বৃষ্টিতে আড়াল দিয়েছে তোমাকে, অসহ্য শীতে সস্নেহে চাদর জড়িয়ে দিয়েছে গায়ে? প্রখর সূর্যের নীচে শুষ্ক কাষ্ঠে যখন অঞ্জলি পেতে দাঁড়িয়েছিল, তখন কে উজাড় করে দিয়েছিল শুশ্রূষার জল?' ('সহযোদ্ধা', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-২, পৃ. ৬০)

> ৩. এখনো মাঝে মাঝে বৃষ্টি নেমে আসে হঠাৎ; ধুলোর গন্ধ ভালোভাবে মরতে না মরতেই থেমে যায় আবার। তখন রোদ ওঠে, হালকা মেঘের সংস্পর্শ জড়ানো নীলবর্ণ আকশ উঠে যায় আরো উঁচুতে। হাওয়া দেয় ক্বচিৎ। তখন বোঝা যায় শীত এসে পড়বে ক্রমশ।" ('সোনালী জীবন', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-২, পৃ. ২৪০)

বিবৃতির ভাষাও উপন্যাসগুলিতে অনবদ্য হয়ে উঠেছে—

> "নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ একা— একার মধ্যেই সম্পূর্ণ হয়ে আছে একটা জগৎ। সেখানে অন্য কোনও মানুষ নেই, কিংবা থাকলেও তাদের সকলেই মুখে আদিত্যর আদল। একই বয়স, সময় ও চৈতন্যের ভারে ঘাড় কুঁজো করে ছুটছে একজনের পিছনে আর একজন... সেখানে ঘটনা ঘটে না কোনও, কিংবা ঘটলেও সচকিত হয় না স্বাভাবিক পরম্পরায়— ওপরে উঠে কিংবা নীচে নেমে, এগিয়ে কিংবা পিছিয়ে, একই মাকড়শা বুনে যায় বিভিন্ন জাল। অদ্ভুত যান্ত্রিকতায় সম্পন্ন হয় সব কিছু।...বই আর খবরের কাগজ পড়া আন্তর্জাতিকতার বোধে অহঙ্কারে ফেঁপে ওঠে বুক— দ্রুত হাতের সই পড়ে ভিয়েতনাম আর বাংলাদেশ বিষয়ে বিবৃতির নীচে।"[১৪]

কবি জীবনানন্দের কবিতার অনেক লাইন দিব্যেন্দু পালিত তাঁর উপন্যাসে ব্যবহার করে বাক্য গঠন করেছেন। যেমন— 'জানলা দিয়ে রোদ ঢুকছিল ঘরে; কচি লেবু-পাতার মতো নরম রোদ', 'ঝলমলে রোদ্দুরে কচি লেবু পাতার মতো একটা অস্ফুট আভা ছড়ানো', স্বচ্ছন্দে টেনে নিয়ে গেল লাশকাটা টেবিলে। দাগগুলো পড়ছে পরপর, রক্ত নয়', তখন ঘাস মাটি নির্জনতার গন্ধে আরো একটু বেশি নিঃসঙ্গ হয়ে ওঠে নিঃশ্বাস— পৃথিবী যতো পুরনো হয়, সে ততোই নতুন হয়ে ওঠে আরো', 'লাশকাটা ঘরের কাঁচের আড়ালের মধ্যে আরো পাঁচ-দশটার সঙ্গে ন্যাংটো করে সুইয়ে দিলে আপনিও সনাক্ত করতে পারবেন না', 'যদি কখনো সুযোগ হয়, এসো, বলবো, তোমাকে গভীর সেই সব অসুখের কথা— যার কোনো নিরাময় নেই; রক্তের গভীর থেকে ঘুণের মতো যা কেবল শেষ করে দিচ্ছে আমাদের!' ইত্যাদি।

বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র পেরিয়ে একসময় আমরা ইংরেজি ঘেঁষা গদ্য পাই। বুদ্ধদেব বসুর লেখায় ইংরেজি-ঘেঁষা এক ধরনের ঝকঝকে গদ্য পাওয়া যায়। সেই গদ্যের অনুকারক তাঁর পরবর্তী অনেক গদ্যলেখকই। বুদ্ধদেব বসুর ছাত্র দিব্যেন্দু পালিতও এর ব্যতিক্রম নন। তবে দিব্যেন্দু পালিতের গদ্যে বুদ্ধদেব বসুর গদ্যের প্রভাব নেই। দিব্যেন্দু পালিত মধ্যবিত্ত মানুষের মুখের ভাষায় বাংলার পাশাপাশি এনেছেন ইংরেজি ও হিন্দি ভাষা। যেমন, হিন্দি ভাষার প্রয়োগ— 'আও জি, একসাথ মরে। উড স্ট্রিট জানে মে খুন হোগা, দমদম জানে মে নেহি'। ('সহযোদ্ধা', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-২, পৃ. ১২), কিংবা, 'ওই গাছকে তলাসে বার হোকর লনসে চলা গিয়া— ' ('উড়োচিঠি', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি

উপন্যস-১, পৃ. ৫৪৫) আবার বাংলার সঙ্গে ইংরেজির মিশ্রণ ঘটিয়ে চরিত্রের মুখে সংলাপ দিয়েছেন। যেমন— 'তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে মেখলার সঙ্গে ইলিসিট রিলেশানশিপ চালিয়ে রাহুল কীভাবে তোমাকে লেট-ডাউন করেছিল'। ('অনুভব', পৃ. ৩১), কিংবা, 'অফকোর্স, আমিও আজকাল পড়ি-টড়ি না। ইন দোজ ডেজ তুই ছিলি আমাদের প্রাইড'। ('আমরা', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যস-১, পৃ. ১৪৯) দিব্যেন্দু পালিত চরিত্র অনুযায়ী মুখের ভাষা ব্যবহার করেছেন। যেমন, 'সন্ধিক্ষণ' উপন্যাসে অফিস কেরানি মৈমনসিং-এর অধিবাসী বামনদাসের উক্তি— 'দ্যাখেন গিয়া রাইটার্স কি নিউ সেক্রেটারিয়েটে ধর্না দিতেছে'। ('সন্ধিক্ষণ', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যস-১, পৃ. ৪৭) কিংবা, 'সোনালী জীবন' উপন্যাসে বড়বাবুকে সারার বর্ণনা দিতে গিয়ে সেপাই যে ভাষায় কথা বলেছে সেটা কেবল তার মুখেই মানিয়েছে— 'মিট্টি বোলিয়ে তো মিট্টি, আসমান বোলে তো আসমান— ফারাক নহি কর সকেগি। আর সাথ দেনে কা হ্যায় ভি কৌন! আপ জো ভি কাহা মান লেগি'। ('সোনালী জীবন', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যস-২, পৃ. ২৩১)

উপমা প্রয়োগের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য এনেছেন দিব্যেন্দু পালিত। যেমন—

১. 'ক্ষুরের ফলার মতো উজ্জ্বল রোদে ফুটপাথ তেতে উঠেছে'। ('সিন্ধু বারোয়াঁ', দিব্যেন্দু পালিতের প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, পৃ. ৩০)

২. 'আকাশে কাক-ডিম রং, যতদূর চোখ যায় আগাগোড়া সিসের পাতের মতো, কোথাও এতোটুকু চিড় খায়নি'। ('ভেবেছিলাম', দিব্যেন্দু পালিতের প্রথম পাচঁটি উপন্যাস, পৃ. ১৯৭)

৩. 'ঝলমলে রোদ্দুরে কচি লেবু পাতার মতো একটা অস্ফুট আভা ছড়ানো'। ('প্রণয়চিহ্ন', দিব্যেন্দু পালিতের প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, পৃ. ৩৮২)

৪. 'ঘামের মতো ঘুম গড়িয়ে পড়ছে শরীর বেয়ে'। ('সন্ধিক্ষণ' দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ১৭)

৫. 'অদূরে টেলিফোনটার দিকে তাকিয়ে কুমিরের মতো একাগ্র চিন্তায় ভাসতে থাকলো সে'। ('সন্ধিক্ষণ', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ৩২)

৬. ‘এখন আর নিজেকে সার্কাসের বাঘের মতো মনে হয় না’। (‘সম্পর্ক’, দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ১১৬)

৭. ‘মশার মতো, নীরবে আমার শরীরে চলে আসছে তার রক্ত’। (‘আমরা’, দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ১৩৭)

৮. ‘ও-টিতে শুয়ে অ্যানাসথেসিয়ার জন্যে অপেক্ষা করার মতো অন্ধকার একটা অনুভূতি হামাগুড়ি দিয়ে ক্রমশ এগোচ্ছে শিরার ভিতর’। (‘বিনিদ্র’, দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ২৭৮)

৯. ‘ঢেউ-তোলা নদীর মতো কী একটা বয়ে যাচ্ছে ভিতরে ভিতরে, কখনোবা অল্প ধাক্কায় মাটি খসিয়ে যাচ্ছে পাড়ের’। (‘উড়োচিঠি’, দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ৫১০)

১০. ‘অ্যাকোরিয়ামে বন্দি ছোট্ট মাছের মতো মুখ নাড়ছে অদৃশ্য কোনো স্পন্দন’। (‘স্বপ্নের ভিতর’, দশটি উপন্যাস-২, পৃ. ৪৩৬)

প্রতীক বা চিত্রকল্প প্রয়োগে দিব্যেন্দুর উপন্যাসে বারবার ফিরে আসে ভোর, সকাল, সন্ধ্যা, গভীর রাত্রি, রাস্তা, টেলিফোন, বৃষ্টি, সিঁড়ি ইত্যাদির প্রসঙ্গ। রাত্রি শেষ হয়ে সদ্য ফুটে ওঠা আলো আর উদাসীন হাওয়ার মধ্যে দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের চরিত্রগুলি নিজেদের চিনে নিতে থাকে। ভোরের রহস্যময় আলোছায়ার মধ্যেই কখনো স্বপ্নে জড়িয়ে পড়ে, কখনো স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে। এই ভোরই তাদের জানিয়ে দেয় তার পরের সময়, আসন্ন ভবিষ্যৎ। ‘সন্ধিক্ষণ’ উপন্যাসে দিনক্ষণ না জানা থাকলেও ‘এক ভোরের দিকে চলে গেলো কনক’। (‘সন্ধিক্ষণ’ দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ১১) তার পরের দিনগুলি আসে ঝিরঝিরে বৃষ্টির বিষণ্ণতায়। ‘বিনিদ্র’ উপন্যাসটি শুরুই হয় এভাবে, ‘জুনের প্রথম সপ্তাহে একদিন সকালে হঠাৎই একটু অবিন্যস্ত হয়ে পড়লো দীপ্ত’। (‘বিনিদ্র’, দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ২৫৯) বড়ো চাকরিজীবী সচ্ছল দীপ্তর জীবনে এমনই কোনো একটা ঘটনা ঘটতে চলেছে, যা তাকে ভাবিয়ে তুলবে, অন্যমনস্ক করে রাখবে— তারই ইঙ্গিত এখানে স্পষ্ট। একটু পরে তাঁর কাছে চাকরিপ্রার্থী আসে, দড়াম করে দরজা বন্ধ করার শব্দটা হানা দেয় তাঁকে ও তার স্ত্রী জয়িতার মনেও। ‘অহঙ্কার’ উপন্যাসের সূচনায়ও দেখা

যায়, নিত্য অভ্যাসের ফলে ঘুম থেকে ওঠার জন্যে ঘড়িতে এলার্ম দেবার দরকার না হলেও বিমানের ভোরবেলা ঘুম ভাঙে অদ্ভুতভাবে এবং আচমকা। 'উড়োচিঠি' উপন্যাসে ভোর টুপুরের জীবনে এক নতুন ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে। সদ্য মাতৃবোধে উত্তীর্ণ ছোটো বৌদির জন্য সারারাত নার্সিং হোমে কাটিয়ে টুপুরের মনে হয়, 'আজ ভোরে একেবারে অন্যরকম হয়ে উঠেছে আকাশ। ঠিক কী রকম বোঝা যায় না। তবে অন্যরকম। আগে কখনো চোখে পড়েনি, এমন'। এবং এই ভোরেই তার হঠাৎ মনে হয়, 'কে জানে কেন, মনে হলো, মেয়ে হলে মা হতে হয়'। ('উড়োচিঠি' দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ৪৬১) এই ভোরের অনুভব থেকেই সে পরিপূর্ণতার দিকে এগোতে থাকে। আবার এই ভোর কারো জীবনে চলার গতিকে স্তব্ধ করে দেয়। 'সহযোদ্ধা' উপন্যাসে আদিত্য রায় ভোরের আলো আধারেই খুন হতে দেখে বিহ্বল দৃষ্টিতে সংসারের দিকে তাকিয়ে নিজেকে আড়াল করতে চেয়েছে।

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে বৃষ্টি একটা ভিন্ন পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তবে বৃষ্টির প্রসঙ্গ তাঁর উপন্যাসে ভালোলাগার পরিবেশে আসেনি। সময়ের সঙ্গে মানসিকতার পরিবর্তনে বৃষ্টির রূপ বদলে গেছে। যেমন— 'সেদিন চৈত্রমাস' উপন্যাসে বৃষ্টির প্রসঙ্গ এসেছে এষার মনস্তত্ত্বের একটা বড়ো উপাদান হিসাবে। মধ্যরাতে একা যখন এষা সহপাঠী অমলেন্দুর স্মৃতিতে নিমগ্ন তখন এসেছে বৃষ্টির প্রসঙ্গ—

> "মধ্যরাতের বৃষ্টিতে কেমন একটা অসহায় ভাব থাকে। নিজের সমস্ত স্নায়ুতে বৃষ্টির কাতর শব্দ শুনেছিল এষা। বড় বড় ফোঁটায় ওর মুখ ভেসে গেল, বুক ভাসলো; ঘরের মেঝেয় পর্যন্ত জল গেল। একা বৃষ্টির সঙ্গে জেগে থেকে এষা বার বার একটি নাম উচ্চারণ করে। মনে মনে চাইছিল, যেন এই রাত্রি ভোর না হয়, এই বৃষ্টি না থামে।"[১৫]

বৃষ্টি দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের অনেক চরিত্রকেই ভাবিয়ে তুলেছে। 'আমরা' উপন্যাসে আকাশে মেঘ জমতে দেখলেই প্রিয়নাথের বুকের ভিতর কেমন একটা উত্তেজনা শুরু হয়ে যায়। 'হয়তো কিছু একটা ঘটবে, কিছু একটা ঘটতে পারে'। ('আমরা', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ১৩৪) আবার 'বৃষ্টির পরে' উপন্যাসে অশোকের প্রবল বৃষ্টিতে তাঁর ভিতর ক্রমশ ঘনিয়ে ওঠে এক মন খারাপ করা অনুভূতি।

"জলের পর জলের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ সহজেই এলোমেলো করে দেয় ভাবনাগুলো গুছিয়ে ভাবতে পারে না কিছু।"[১৬]

'অহংকার' উপন্যাসে অসুস্থ স্বামীর জন্য ডাক্তারের কাছে যাবার সময়ে খুব জোরে বৃষ্টি নামলে নীপার মনে হয়—

"এই বৃষ্টি শুভ নয়; বৃষ্টির আড়ালে জড়িয়ে আছে এমন কোনো তাৎপর্য, যা সে ধরতে পারছে না। শুধু ছুঁয়ে যাচ্ছে অস্পষ্ট একটা সম্ভাবনা।"[১৭]

'সহযোদ্ধা' উপন্যাসে অফিসে কাজ করতে করতে হঠাৎ বৃষ্টির শব্দে খাপছাড়া বোধ করে আদিত্য। বৃষ্টির মধ্যদিয়ে ভাবতে ভাবতে তার অস্বস্তি শুরু হয়। বৃষ্টিতে ঝাপসা হয়ে আসে জানলার কাঁচ। তবু একটা দৃশ্য চোখে ভাসতে থাকে— পরিষ্কার ময়দান। সে জায়গাটায় সবুজ বড়ো বড়ো আঁশের ঘাসের ওপর অবিরল ঝরে চলেছে বৃষ্টি। বৃষ্টি এখানে শুধু বৃষ্টিই নয়, তার বিবেকের অবিরল ধারাপাতের প্রতীক। আবার বাড়িতে থাকার সময় মধ্যরাতের বৃষ্টি তাকে বড়ো একা করে দেয়। কারণ না থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু 'অ্যাবস্ট্রাক্ট' ভাবনা ঘিরে ধরে তাকে। উপন্যাসের শেষেও মুষলধারা বৃষ্টির রাতেই তাঁকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায় পুলিস। শুধু আদিত্যকেই নয়, এই 'অ্যাবস্ট্রাক্ট' ভাবনা ঘিরে ধরে 'ঢেউ' উপন্যাসের অপূর্বকেও। অপরেশ গুপ্তর হাতে রেজিগনেশন দিয়ে রাস্তায় নামতেই অপূর্বর 'ঝির ঝির বৃষ্টির মধ্যে প্রায় উদ্দেশ্যহীন যে অনুভূতি এলো তাঁর নাম শূন্যতা'। এই মুহূর্তে অপূর্বর মন তাকে অতীতেও যেতে দেয়নি, ভবিষ্যতেও না। আকাশের দিকে তাকাতেই বৃষ্টি চলে আসে। এইভাবে ঘটনা ঘটে যাবার আগে ও পরে বৃষ্টি নেমে এসেছে। বৃষ্টি দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে কখনো সুখের হয়ে আসেনি। কখনো রোমান্টিকতা আনেনি।

'ঘরবাড়ি' উপন্যাসেও বৃষ্টির জলে ধুয়ে যেতে দেখা যায় কাঁচ। সেই কাঁচ যার মধ্যে কার্পেটে মোড়া ঘরে হিমাদ্রি নিয়ে এসেছে ওর স্ত্রী জয়াকে মডেলিং করে কিছু উপার্জন করে তাদের ফ্ল্যাটবাড়ির শেষ কিস্তি শোধ দিতে। তাদের ভবিষ্যৎ যে স্বচ্ছ নয়— লেখক এই বৃষ্টির জলে ঝাপসা-হওয়া, ধুয়ে-যাওয়া জানলার কাঁচ দিয়ে বুঝিয়ে দেন। 'ঢেউ' উপন্যাসটি শুরু হয় বৃষ্টির রূপকল্প দিয়ে— 'এরকম হয় কখনো, বৃষ্টিঝরা আকাশের দিকে তাকালেও হঠাৎ ধাঁধা লাগে চোখে, মনে হয় বৃষ্টি নয়, রোদ্দুরই ঢুকে পড়েছে চোখে'। ('ঢেউ', দশটি উপন্যাস-

২, পৃ. ২৭৯) সমস্ত উপন্যাসটি জুড়ে বৃষ্টির ঢেউয়ের মতো কেউ কাউকে বুঝতে পারেনি। অপূর্ব বুঝতে পারেনি সীতাকে, সীতা বোঝেনি অপরেশকে, বিমলকৃষ্ণকেও বোঝেনি তার ছেলে। জীবনের চলার পথে খুবই জটিল হয়ে পড়েছে মানুষের স্বরূপ বোঝা। 'সোহিনী এখন কোথায়' উপন্যাসে ধীমান তার স্ত্রীকে হারিয়েছে। বৃষ্টি পড়লেই তপতী, নীপা, গার্গীরা অতীত স্মৃতিতে ভেসে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছে। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে বৃষ্টি এইভাবে প্রতীক হয়ে ওঠে, কখনো সময়ের প্রতীক, কখনো নিজেকে চেনার প্রতীক।

রাস্তা দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে প্রবহমানতার ইঙ্গিত নিয়ে এসেছে। 'একা' উপন্যাসের শুরুতেই 'বারো দিন পরে একদিন সকালে রাস্তায় বেরিয়ে খুব ঝরঝরে বোধ করল শিশির'। ('একা', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ৩৯৩) 'উড়োচিঠি'তে রজত দৌড়ে বেরিয়ে যায় রাস্তায়। পথ খোঁজে জীবনে চলার। 'মৌনমুখর'-এ বিধ্বস্ত তড়িৎ ঘরে না গিয়ে রাস্তা মুখো বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। ব্রততীর মানসিক টানাপোড়েনে রাস্তা তাকে আরো ভাবিয়ে তুলেছে।

টেলিফোন-এর ব্যঞ্জনা 'অন্তর্ধান' উপন্যাসে সুশোভনের জীবনে ট্র্যাজেডি নিয়ে আসে। তার দাদা হার্ট আট্যাক করলে মেয়েকে পাঠিয়েছে দেখতে। কিন্তু সময় গড়িয়ে গেলেও মেয়ে বাড়িতে ফেরেনি। ফোন করতে গেলে টেলিফোনে ডায়ালটোন পায়নি সুশোভন। অপেক্ষার সময়টা নির্ভর করে টেলিফোনের ওপরে। কিন্তু টানা বেজে গেছে এনগেজ সাউন্ড। সুশোভনের ক্রমাগত রিং করার চেষ্টা একটা চাপ সৃষ্টি করে তার মনে। তখন থেকে শুরু হয়ে যায় নিজেকে আগলে রাখার চেষ্টা। আবার যখন বিপদ বাড়তে থাকে টেলিফোনেই শুনতে পায় তাদের মেয়ে পুতুলের অন্তর্ধানের ঘটনা। 'মাত্র কয়েকদিন', 'বহুদূর অভিমান' প্রভৃতি উপন্যাসেও টেলিফোনের ভাঙা ডায়ালটোনের ব্যঞ্জনা জীবনের ছন্দকে এলোমেলো করে দেয়। 'বহুদূর অভিমানে' রাজদীপ তার মায়ের টেলিফোনের লাইন পায়নি বলে প্রায় পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল। অধৈর্য এবং রাগে-অভিমানে সে মা-কেই দোষী ভেবেছে। জীবনের চলার মধ্যে যে শূন্যতা, যে নৈশব্দ 'মাত্র কয়েকদিন' উপন্যাসের সূচনায় সেই ব্যঞ্জনা টেলিফোনের বেজে যাওয়ার ইঙ্গিতে ধরা পড়ে—

> "টেলিফোন বাজছে অনেকক্ষণ ধরে। সময় নিয়ে, থেমে থেমে, কিন্তু রীতিমতো স্পষ্টতায়। স্বপ্নে যেমন বাজে কখনও, মনে হয় উদ্দেশ্যহীন, কাউকে চায় না; যান্ত্রিক

ক্লান্তিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বেজে যায় শুধু। আবার, ওই শব্দে ঘুম ভেঙে যাবার মুহূর্তেই হারিয়ে যায় শব্দের রেশ। ফিরে আসে নৈঃশব্দ্য।"[১৮]

সিঁড়ি উপরে ওঠার জন্য। সকলেই জীবনে উপরে দিকে এগোতে চায়। জয়ার একটাই স্বপ্ন নিজের বাড়ি হবে, নিজের ছাদ হবে। সেই ছাদ থেকে আকাশ দেখবে। জীবনের সব আশা পূর্ণ হবে।

"মনের ভিতর পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে একটার পর একটা সিঁড়ি উঠে গেছে আকাশের দিকে, তার চারপাশে যে দেয়াল সেখানে শুধুই আঁকা নিজস্ব অধিকারের দিকে, এগোনোর চিহ্ন— দাগগুলো চিনে চিনে ক্রমশ কিন্তু নিশ্চিত ভাবে উঠে যেতে পারবে ওপরে।"[১৯]

কিন্তু ইচ্ছা যে গতিতে এগোয় সাধ্য ঠিক তা পারে না। সিঁড়ির প্রথম দিকের একটি ধাপেই পা রেখেই তাই সে জিরিয়ে নেয়। 'ঘরবাড়ি' উপন্যাসে জয়ার জীবনসংগ্রাম এবং সাধ্য না থাকা সত্ত্বেও স্বপ্নে দেখা ইচ্ছাকে এইভাবে লেখক সিঁড়ির ব্যঞ্জনায় উপন্যাসের শুরুতেই তুলে ধরেছেন।

দিব্যেন্দু পালিত উপন্যাস সম্পর্কে একটা নতুন আঙ্গিকের খোঁজ করেছেন। তাঁর সমস্ত লেখা ছড়ানো নয়। খুবই কেন্দ্রীভূত এবং একটা বিশেষ বোধের ওপর দাঁড়িয়ে আছে লেখাগুলি। এদিক থেকে তিনি কাফকা এবং কামুর অনুসারী। কাফকা এবং কামুর উপন্যাসগুলিকে যেমন পৃথিবীর মডার্ন ক্লাসিক বলা যায়, তেমনি দিব্যেন্দু পলিতের লেখাগুলিও ব্যতিক্রম নয়। দিব্যেন্দু পালিতের লেখাগুলিও আকারে ছোটো, চরিত্রে স্বল্পতা, ভাষা সংযম আর প্রচণ্ড মূল্যবোধের উপর দাঁড়িয়ে আছে। আর আছে কবিত্ব এবং বর্ণনাকুশলাতাও।

তথ্যসূত্র :

১. পালিত, দিব্যেন্দু : কিছু স্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান, সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯১, পৃ. ১০২

২. পালিত, দিব্যেন্দু : মধ্যরাত, প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৩০৭

৩. পালিত, দিব্যেন্দু : প্রণয়চিহ্ন, প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৩৫৭

৪. তদেব : পৃ. ৪৪৭

৫. পালিত, দিব্যেন্দু : কিছু স্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান, সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯১, পৃ. ১০৭

৬. দত্ত, হর্ষ (সম্পাদিত) : দিব্যেন্দু পালিতের মুখোমুখি, বইয়ের দেশ, কলকাতা, জানুয়ারি-মার্চ ২০১৬, পৃ. ১২৩

৭. পালিত, দিব্যেন্দু : আমরা, দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫ পৃ. ১২৯

৮. Palit, dibyendu : Writing : My Experience, Sahitya Academy Writers' Meet, Delhi, 24th February, 1999, p. 2

৯. তদেব : পৃ. ৩

১০. দত্ত, হর্ষ (সম্পাদিত) : দিব্যেন্দু পালিতের মুখোমুখি, বইয়ের দেশ, কলকাতা, জানুয়ারি - মার্চ ২০১৬, পৃ. ১২৪

১১. রায়, প্রদীপ্ত (সম্পাদিত) : প্রিয়দর্শিনী, দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, জানুয়ারি - মার্চ ২০০৩, পৃ. ১২৩

১২. পালিত, দিব্যেন্দু : আড়াল, দশটি উপন্যাস-২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১২, পৃ. ১৯৪

১৩. পালিত, দিব্যেন্দু : সহযোদ্ধা, দশটি উপন্যাস - ২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১২, পৃ. ১৬

১৪. তদেব : পৃ. ৪৮

১৫. পালিত, দিব্যেন্দু : সেদিন চৈত্রমাস, প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ২০

১৬. পালিত, দিব্যেন্দু : বৃষ্টির পরে, দশটি উপন্যাস - ১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫ পৃ. ১৮৭

১৭. পালিত, দিব্যেন্দু : অহঙ্কার, দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫ পৃ. ৬০৬

১৮. পালিত, দিব্যেন্দু : মাত্র কয়েকদিন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ৭

১৯. পালিত, দিব্যেন্দু : ঘরবাড়ি, দশটি উপন্যাস-২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১২, পৃ. ৭৩